কৃষকদের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রসঙ্গে

কৃষক ও মজুর এবং সেই অর্থে সকল স্তরের শ্রমজীবী মানুষকে মেকি বিপ্লবী দলগুলির দ্বারা সৃষ্ট মোহজাল থেকে মুক্ত হতে হবে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে সঠিক নেতৃত্বে, সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সংগ্রাম সংগঠিত করে সেই সংগ্রামকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি অর্থাৎ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এটাই ছিল ১৯৭৪ সালের মার্চে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদত্ত ভাষণের বার্তা। সেই ভাষণের সারাৎসারটি এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

বন্ধুগণ,

কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের (কে কে এম এফ)[১] দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন। এমন একটা সময়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে সময়টা সমস্ত দিক থেকেই ভারতবর্ষের অত্যন্ত দুঃসময়। গোটা দেশের মানুষের জীবনযাত্রা একটা গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন।

ভারতবর্ষের জনজীবনের বর্তমান চিত্রটা কী, সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা কোন্ চরমে পৌঁছেছে, সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কী অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে এবং মানুষের আর্থিক সঙ্কট কী চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে, তা আপনারা জানেন এবং আপনারা নিজেরাই তার ভুক্তভোগী। আপনারা প্রাত্যহিক জীবনে যা উপলব্ধি করছেন, আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে ঘটনা দিয়ে, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে তার চেয়ে বেশি কিছু আমার বোঝাবার প্রয়োজন নেই। যে কথাটি আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তা হচ্ছে, আমাদের দেশে যেখানে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, জমিতে সোনার ফসল ফলে, মাটির নিচে খনিতে রয়েছে কয়লা, লোহা, তামা, সোনার মতো অমূল্য খনিজ সম্পদ, রয়েছে বনসম্পদ এবং সর্বোপরি রয়েছে ৫৩/৫৪ কোটি মানুষর শ্রমশক্তি — সেখানে এসব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য এমন চরমে পৌঁছেছে কেন? ২৬ বছর হয়ে গেল ভারতবর্ষে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ তো আর একথা বলা চলবে না যে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেশের সম্পদ, কাঁচামাল আর শ্রমশক্তি লুটে নিয়ে চলে যাচ্ছে বলেই দেশের মানুষের এই দুর্গতি। আজ যদি দেশে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কোথাও ঘটেও থাকে, তবে তার সুযোগ এদেশের বর্তমান পুঁজিবাদী সরকারই করে দিচ্ছে ;নাহলে তা ঘটতে পারত না। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের নেতারা বলতে শুরু করেন, দীর্ঘ দুশো বছরব্যাপী ইংরেজ শাসনের গ্লানি একদিনে হঠানো যায় না। ঠিক আছে, আমরা মেনে নিলাম; দেশের এই গভীর ব্যাধি, একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা তো আশা করা যায় যে, ২৬ বছরে অন্তত ছাব্বিশ ইঞ্চি আমরা এগোব? সমস্ত দিক থেকেই এটা স্পষ্ট যে, মানুষের এই প্রত্যাশা পুরোপুরি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, শুধু তাই নয়; যে কোন বয়স্ক মানুষকে জিগ্যেস করলে তিনি অবশ্যই বলবেন, স্বাধীন হওয়ার পর দেশের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, বেকার সমস্যা যেখানে পৌঁছেছে, পুলিশি জুলুম যে আকার নিয়েছে, বিচারের নামে যে প্রহসন চলছে এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি যেভাবে ছেয়ে গিয়েছে, তাতে সব দিক থেকেই আজকের অবস্থা ইংরেজ আমলের চেয়েও খারাপ হয়েছে। সকল প্রবীণ মানুষই এসত্য বলবেন যে, ইংরেজ আমলে মানুষের জীবন অন্তত আজকের মতো এমন দুঃসহ ছিল না; এমন শ্বাসরোধকারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, দেশে বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা, যা বিগত ২৬ বছরে কমার কথা ছিল, শহর ও গ্রাম দু'জায়গাতেই তা ব্যাপক হারে বেড়েছে। আধুনিক বিশ্বে সম্ভবত এমন একটিও দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, যার মাথাপিছু আয় আমাদের দেশের মতো এত কম। যদিও একথা আমাদের জানা যে,

এই মাথাপিছু আয়ের হিসাব সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের একটা পরিকল্পিত চালাকি; কেন না, এর মধ্যে এমনকী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, ধনকুবের গোষ্ঠীর লোকেদের আয়ও ধরা আছে; কাজেই এটা শুধু পরিসংখ্যানের একটা গড় হিসাব দেয় মাত্র; আমাদের সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষদের আয়ের প্রকৃত চিত্র এতে পাওয়া যায় না। তবুও এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের মাথাপিছু আয় ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এর মূল্য আরও কমে যাবে যদি ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া মূল্যবৃদ্ধি র হিসাবটা যুক্ত করা হয়। এই আয় প্রকৃত মূল্যের বিচারে আরও কমে গিয়েছে। এখন এই হিসাব থেকে আমাদের সমাজের সবচেয়ে বিত্তবান অংশের আয় যদি আমরা বাদ দিই, তবে চিত্রটা কী ভয়াবহ দাঁড়াবে, তা সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি।

শুধু মজুরিবৃদ্ধি কোন সমাধান নয়

একথা ঠিক, যারা কোন না কোন কাজ করে, চাকরি-বাকরি করে, টাকার অঙ্কে তাদের রোজগার স্বাধীনতার পর বেড়েছে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মাইনে যে হারে বেড়েছে, সমস্ত আবশ্যিক জিনিসপত্রের দাম এবং সাধারণভাবে জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। সকলেই জানেন, এমনকী স্বাধীনতার আগেও জিনিসপত্রের দামের তুলনায় মাইনে কম থাকার জন্য শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কাজেই আজ যখন সমস্ত আবশ্যিক জিনিসের দাম, জীবনযাত্রার অন্যান্য খরচ বহু গুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে মজুরি ও মূল্যসূচকের মধ্যকার ফারাকটাও অনেক বেড়েছে, তখন টাকার অঙ্কে যদি মজুরিবৃদ্ধি ঘটেও থাকে, তাতেও সাধারণ গরিব মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা আজ কোন্ জায়গায় পৌঁছেছে, তার পরিমাপ করা মোটেই কষ্টকর নয়। আগে কম টাকা রোজগার করেও একটা পরিবার যেভাবে চলতে পারত, জীবনযাত্রার যে মান বজায় রাখতে পারত, আজ টাকার অঙ্কে রোজগার বাড়লেও সেভাবে পরিবার প্রতিপালন করা যাচ্ছে না। তাই টাকার অঙ্কে মানুষের মাইনে বেড়েছে, মানুষের আয় বা রোজগার কিছু বেড়েছে — শুধু এই কথা বললেই সমস্যার চরিত্র সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। সমস্যাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে দেখতে হবে, জিনিসপত্রের দাম যে পরিমাণে বেড়েছে, সেই পরিমাণে টাকার অঙ্কে খেটে-খাওয়া মানুষের রোজগার বেড়েছে কিনা। দেখতে হবে, আগে সাধারণ মানুষের গড়পড়তা যা আয় ছিল এবং সেই অনুপাতে জিনিসপত্রের যা দাম ছিল, আজ জিনিসপত্রের দাম তখনকার তুলনায় যে অনুপাতে বেড়েছে টাকার অঙ্কে মানুষের আয় সেই অনুপাতে বেড়েছে কিনা। এভাবে বিচার করলে একথা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, অঙ্কের হিসাবে মজুরের মজুরি বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের তুলনায় আসল মজুরি অনেকাংশেই কমে গিয়েছে।

ফলে স্বাধীনতার আগে খেটে-খাওয়া মানুষের অবস্থা যে জায়গায় ছিল, টাকার অঙ্কে মজুরি বৃদ্ধি র ফলে তাদের সেই অবস্থার কোনও উন্নতি তো ঘটেইনি, বরং সমস্ত আবশ্যিক জিনিপত্রের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি র ফলে মজুরদের জীবনযাত্রার মান আরও খারাপ হয়েছে।

কাজেই একটা মূল জিনিস আপনাদের ধরতে হবে। তা হচ্ছে, শুধু রোজগার কিছু বাড়লেই জীবনের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে না। আজ মজুরিবৃদ্ধি র দাবিতে লড়াই কলকারখানার মজুরদেরও যেমন করতে হচ্ছে, গ্রামের খেতমজুরদেরও করতে হচ্ছে। আর এইসব লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যদি মজুরি দু'চার টাকা বাড়াতেও তারা সফল হয় — যেটার জন্য তাদের বহু লড়তে হচ্ছে, রক্ত দিতে হচ্ছে, কত ছেলের প্রাণ যাচ্ছে, কত মা পুত্রহারা হচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীহারা হচ্ছে, কত লাঠি চলছে, কত গুলি চলছে, সরকারের কত রকমের নির্যাতনের মুখে তাদের পড়তে হচ্ছে, তারপর হয়তো সামান্য মজুরি বাড়ছে — একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মজুরিবৃদ্ধি র দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং তার ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে, তার ধাক্কা আটকানো যাবে না।

সামান্য দু'চার টাকা বাড়তি মজুরি যা মজুররা পাচ্ছে তার জন্য বহু লড়াই, বহু রক্তক্ষয় তাদের করতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়, যা তারা পাচ্ছে তার চেয়েও বেশি টাকা — একদিকে বাজারে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ও জীবনধারণের অন্যান্য খরচ বাড়িয়ে এবং অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নানা নতুন নতুন কর চাপিয়ে — তাদের পকেট থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই কারণে বাড়তি মজুরি মানুষকে কোন 'রিলিফ' দিতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের মূল সমস্যাটা কোন্ জায়গায় এবং গ্রাম ও শহরের চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত

মানুষদের সামনে মূল সমস্যাটা কী, তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। এইসব মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেলে শুধু কংগ্রেস-বিরোধী স্লোগান তুললেই বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা করলেই কাজ কিছু হবে না। কংগ্রেস দেশের সর্বনাশ করে দিয়েছে, একথা আজ সকলেই জানেন। দেশের বেশিরভাগ মানুষই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন, কংগ্রেসি শাসনে কী দুর্দশার মধ্যে আমাদের দিন কাটছে। কোন সৎ, সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কংগ্রেসকে পছন্দ করেন বলে আমি মনে করি না। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ — কিছু বড়লোক, স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি, সমাজের উঁচুতলার কিছু লোক — যারা সংকীর্ণ স্বার্থবোধ নিয়ে চলে, যারা সর্বদাই কংগ্রেস থেকে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে কোন না কোন সুবিধা নিচ্ছে, তারাই কেবল শাসক দলকে সামাজিক সমর্থন যোগায়। তবে একথা সত্য যে, পুরনো কংগ্রেস ভেঙে শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস তৈরি হওয়ার পর জনসাধারণের একটা বড় অংশের মধ্যে শাসক কংগ্রেস তথাকথিত প্রগতিশীল একটা ভাবমূর্তি, একটা তথাকথিত 'ইন্দিরা ইমেজ' তৈরি করতে পেরেছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে শাসক কংগ্রেসকে সিপিআই ও সিপিআই(এম) সমর্থন দেওয়ার জন্য;পাশাপাশি দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্বলতা ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মানও এজন্য দায়ী। কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবেই একটা সাময়িক ব্যাপার এবং সরকারের অবস্থা টালমাটাল হওয়ার পর থেকে গত কয়েক বছরে শাসক কংগ্রেসের চরিত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মানুষের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটছে। ফলে আমাদের কাজ হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে এদের সম্পর্কে যেসব মোহ রয়েছে, সেগুলোকে দূর করা এবং কংগ্রেস নেতারা চালাকি করে, মিথ্যা বলে প্রতিদিন যেসব বিভ্রান্তি মানুষের মনে সৃষ্টি করছে, সেগুলোকে পরিষ্কার করে দেওয়া। কিন্তু যে আসল কথাটা বোঝা আপনাদের একান্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে জনসাধারণের এই দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ কী এবং কী করলে সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে আমরা মুক্তি পাব? কোন কোন রাজনৈতিক দল প্রচার করে এবং দাবি করে যে জনগণ যদি কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে পারে এবং তাদের দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে যায়, তবে তারা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। আমি বলি, এসব পুরোপুরি অর্থহীন এবং ডাহা মিথ্যা কথা। এসব কথা যারা বলে, তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যতই গলা ফাটাক, আসলে তারাও জনতাকে ঠকায়। এদের সম্পর্কে লেনিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে। লেনিন বলেছেন, এরা হ'ল ভেড়ার পোষাক পরা নেকড়ের দল। শোষিত জনসাধারণকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, তারা যেন এইসব ভেড়ার চামড়া আচ্ছাদিত নেকড়েদের মধুর বচন ও গরম ভাষণে বিভ্রান্ত না হন। কারণ, এরা আসলে জনতার কাছ থেকে সত্য লুকিয়ে রাখতে চায়।

পুঁজিবাদী শোষণই সব সমস্যার মূল কারণ

আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, জনগণের উপর এই যে শোষণ-জুলুম আজ চলছে, এর মূল কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। শহরের কলে-কারখানায় হোক, আর গ্রামের জমিতে হোক, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে উৎপাদন হচ্ছে;অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতেই সর্বত্র উৎপাদন হচ্ছে।

শহরের কলে-কারখানায় আমাদের দেশে যে উৎপাদন হচ্ছে, সেই উৎপাদনের চরিত্র যে পুঁজিবাদী, তা বোঝা খুব কঠিন নয়। এমনকী আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রকৃতি ও চরিত্রও মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেই রূপান্তরিত হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমাদের কৃষি অর্থনীতিও মূলত পরিচালিত হচ্ছে। যদিও ভারতবর্ষের মতো একটি পিছিয়ে-পড়া দেশে এই মালিক-মজুর সম্পর্কের রূপ দেশের এক এক প্রান্তে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এক এক রকম, তাহলেও সর্বত্রই এই সম্পর্কের চরিত্র মূলত মালিক-মজুরের চরিত্র। একদল মালিক পুঁজিপতি, আর একদল মজুর। কেউ মাস-মাইনের ভিত্তিতে মজুর, আবার কেউ দৈনিক রোজের ভিত্তিতে মজুর। কেউ খানিকটা টাকার অঙ্কে রোজ পায়, খানিকটা অংশ খাদ্যে পায়; কেউ আবার পুরো মজুরিটাই ফসলের ভাগ হিসাবে নেয়। মজুরির 'ফর্মে'র (ধরনের) মধ্যে যতই পার্থক্য থাক, সকলেই মজুরি করে। আর একটা দিক থেকে বিষয়টিকে বিচার করলেও আপনারা দেখতে পাবেন, আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতেই উৎপাদন হচ্ছে। পুঁজিবাদ কাকে বলে? পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হচ্ছে — জমিতে হোক, কলে-কারখানায় হোক, পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজি বৃদ্ধি ঘটানো। অর্থাৎ উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ এবং বাজারে সেই উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে পুঁজির পরিমাণ বাড়ানো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা কলে-কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ করে মাল

তৈরি করে; তারপর সেই মাল বেশি দামে বাজারে বিক্রি করে — যে পরিমাণ টাকা তারা বিনিয়োগ করেছিল, তার চেয়ে বেশি লাভ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই লাভ তারা সংগ্রহ করে মজুরকে শোষণ করে; মজুর তার শ্রমশক্তি দিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে তা আত্মসাৎ করে, মজুরকে ন্যায্য মজুরি ফাঁকি দিয়ে। একেই আমরা বলি পুঁজিবাদ।

এবার দেখা যাক, আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চেহারাটা কী। আজ গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারাটা কি এরকম যে, জমির মালিক যারা, তারা জমিতে যে ফসল উৎপাদন করে, তা দিয়ে, সামন্তী ব্যবস্থার মতো মূলত নিজেদের ভরণপোষণ করে এবং বাকি ফসল স্থানীয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে? আজ গ্রামে উৎপাদিত ফসলের দাম কি একটা বিশেষ স্থানীয় বাজারের চাহিদা ও জোগানের নীতির ভিত্তিতেই মূলত পরিচালিত স্থানীয়ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতির নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে? নাকি সকল কৃষিজাত পণ্য আজ জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে পর্যবসিত হয়েছে? একজন অতি সাধারণ মানুষও এখন রেডিও শুনলেই ধরতে পারবেন, চাষবাসের সমস্ত ফসলের দাম আজ শেয়ার বাজার, পাইকারি বাজার আর 'স্টক এক্সচেঞ্জে'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এদের দ্বারা নির্ধারিত দরে জমির মালিকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করছে এবং নিজেদের সম্পদের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। ফলে জমিও আজ কারখানার মতই পুঁজির রূপে টাকা বিনিয়োগের একটা ক্ষেত্র, একটা উপায়ে পরিণত হয়েছে। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে, লাভ করার মধ্য দিয়ে পুঁজি বাড়ানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের শিক্ষাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি ও চরিত্র দিয়েই মূলত কৃষি অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতিকে বিচার করলে আপনারা দেখতে পাবেন — প্রথমত, এখানে জমি মুষ্টিমেয়র হাতে দারুণভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর আর ক্ষুদ্র ও আধা-সর্বহারা চাষী, যাদের হাতে সামান্য পরিমাণ জমি আছে এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে; এবং সর্বোপরি, কৃষিজাত ফসল এখানে আর স্থানীয় কৃষি-বাজারের পণ্য নয়; তা জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতিও পুঁজিবাদী অর্থনীতিই। এই সত্যকে একমাত্র তারাই অস্বীকার করে যারা এই প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে চায় না, একে বিপ্লবের আঘাতে উৎখাত করতে চায় না, যারা পুঁজিবাদী শোষণ ও বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের দায়ভার তুলনায় অপ্রাসঙ্গিক ও অকিঞ্চিৎকর অন্য কোন শক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে আগ্রহী এবং তার দ্বারা নকল শত্রু খাড়া করে আসল শত্রুর দিক থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় এবং যারা পুঁজিবাদকে রক্ষা করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে চলে, যারা পুঁজিবাদকে আরও সংহত হতে, আরও জবরদস্ত হয়ে মানুষের বুকে চেপে বসার সুযোগ করে দেয়, তারাই একমাত্র এই সত্য অস্বীকার করে। এরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলছে কি না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলছে কি না, একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছে কি না, সেটা আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়; এদের কারো সাথেই জনতার বিপ্লবী আন্দোলনের কোনরকম সম্পর্ক নেই।

কারণ, একথাটা গভীরভাবে বিচার করে দেখা দরকার যে, কেন আমরা কংগ্রেসবিরোধী? কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কি কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে, নাকি কংগ্রেসের নেতারা আজ ক্ষমতায় থেকে যেভাবে লুটেপুটে খাচ্ছে, আমরা তার ভাগ পাচ্ছি না বলে আমরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছি? না, একেবারেই তা নয়। আমরা কংগ্রেসের বিরোধী, কারণ যে পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ, যেকথা আমি আগে আলোচনা করে দেখিয়েছি, কংগ্রেস ছলে-বলে-কৌশলে সর্বতোভাবে সেই শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই রক্ষা করছে। ফলে, নিছক কংগ্রেস-বিরোধিতার কোন মানে-ই নেই যদি আপনি একই সঙ্গে পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করেন, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন কর্মসূচি এবং সেই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার কোন উদ্যোগ যদি আপনার না থাকে। কাজেই একথা পরিষ্কার যে, যেসব দল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নয়, যাদের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কোন কর্মসূচি নেই, তারা যতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলুক এবং নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করুক, তাদের কংগ্রেসবিরোধিতার সাথে সংগঠন কংগ্রেস, প্রগতি দল[২], বি কে ডি[৩], এস পি[৪], এস এস পি[৫] এবং এ জাতীয় অন্যান্য পার্টির কংগ্রেস-বিরোধিতার কোন পার্থক্য নেই। এইসব দলগুলো — শুধু পরের দলগুলোই নয়, আগের দলগুলোও — যারা 'টিপিক্যাল' 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক' শক্তির মতো শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে

কাজ করে চলেছে, তাদের কথায় জনসাধারণের বিভ্রান্ত হলে চলবে না। জনগণ যদি সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে সত্যি সত্যিই মুক্ত হতে চায়, তবে তাদের বুঝতে হবে যে, সমস্ত জাতের সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পারলেই কেবল তারা পুঁজিবাদকে খতম করতে পারবে। স্ট্যালিনের একটি সুপরিচিত শিক্ষাকে আপনাদের স্মরণ করতে বলব। তিনি বলেছিলেন, "সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে উৎখাত করা অসম্ভব।" স্ট্যালিনের এই ঐতিহাসিক শিক্ষার তাৎপর্য যাঁরা বোঝেন না, তাঁরা ধরতেই পারবেন না, কেন যুক্তফ্রন্ট বা অন্য কোন জোটের মধ্যে সিপিআই, সিপিআই(এম) এবং অন্যান্য দলগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলতে চলতেই এস ইউ সি আই গণআন্দোলনে এইসব দলগুলির সোস্যাল ডেমোক্রেটিক কলাকৌশলকে রাজনৈতিকভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে যায়।

জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে

এই পুঁজিবাদী শোষণই জনগণের সমস্ত প্রকার দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ — একথাটা ভাল করে না বুঝলে, অত্যন্ত আবশ্যিক এই রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে শুধু জমির সুষ্ঠু বিলিবণ্টন, মজুরিবৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা নিয়ে যাবতীয় লড়ালড়িই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে না; চাষী-মজুর-খেটেখাওয়া মানুষের শোষণমুক্তির লক্ষ্য ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। গণতান্ত্রিক নানা দাবিদাওয়া নিয়ে যেসব লড়াই এদেশে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে উত্থান-পতন আছে, কখনও দুটো লড়াইয়ে আপনারা জিতবেন, দাবি আদায় করবেন; আবার কখনও লড়াইয়ে আপনারা হারবেন। কখনো দু'পা এগোবেন, আবার কখনও মার খেয়ে দশ পা হটে যাবেন। লড়াইগুলো এভাবেই চলতে থাকবে যতদিন না পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনা আয়ত্ত করতে না পারলে দুটো সম্ভাবনা আপনাদের সামনে থাকবে — যখন আপনারা জিতবেন, ভাববেন খুব জয় হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি দেখা দেবে; এমনকী আপনারা শোধনবাদী চিন্তার শিকারও বনে যেতে পারেন। উল্‌টোদিকে লড়াইয়ে যখন মার খেতে থাকবেন, তখন হতাশা ও পরাজিত মনোভাবে আপনারা ভেঙে পড়বেন। আসলে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আপনাদের বুঝতে হবে, এইসব লড়াইগুলো কী ধরনের হবে এবং কোন্ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো পরিচালনা করতে হবে। নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায় করা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ করা নিয়ে যেসব লড়াই আপনারা প্রতিদিন করে চলেছেন, সেগুলোকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াই হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যখন আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন এবং সেই লক্ষ্যে সঠিক কর্মপদ্ধতিও অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন, একমাত্র তখনই বর্তমান অবস্থাকে আপনারা পাল্‌টাতে পারবেন। না হলে, শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে, ইলেকশন জিতে, এমনকী একটা বিকল্প সরকার গড়েও আপনারা অবস্থা পাল্‌টাতে পারবেন না; জমির উপযুক্ত বিলি-বণ্টন ও মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে হাজার লড়াই করেও অবস্থা পাল্‌টাতে পারবেন না। আবার প্রতিদিনকার এই লড়াইগুলোর দ্বারাই আপনারা অবস্থা পাল্‌টাতে পারবেন, যদি আপনারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হন, যদি এই লড়াইগুলোর সামনে আপনাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঠিক থাকে, যদি আপনারা সংগঠনকে এমন রাজনৈতিক রূপ দিতে সক্ষম হন — যার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারেন।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রাম ও অঞ্চল স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত কে কে এম এফ-এর কমিটিগুলোকে আপনাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কমিটির সদস্যরা নিজেরাই পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরি করতে পারে, লড়াই চালাতে পারে। গ্রামের মানুষকে পরিচালনা করতে পারে, যেকোন রকম কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, মেকি মার্কসবাদের প্রভাব থেকে প্রতিনিয়ত নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে, মার খেয়ে পিছু হঠলেও বিমূঢ় হয়ে যারা নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি গুলিয়ে ফেলে না, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে — লাগাতার এইসব লড়াইগুলোকে, সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামগুলোকে পরিচালনা করতে করতেই, আজ হোক, কাল হোক, পুঁজিবাদকে খতম করে বিপ্লব জয়যুক্ত হবেই। এরকম একটা অপ্রতিরোধ্য, রাজনৈতিকভাবে সচেতন সংগঠন গড়ে তোলাকেই আমরা বলি জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলা। ভোটে জেতা প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করাকে আমরা কখনই

জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বলে অভিহিত করি না। জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলার অর্থ একটাই; তা হচ্ছে — জনতা তাদের নিজস্ব এমন একটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যার দ্বারা তারা কেবল স্থানীয় ভিত্তিতেই নিজেদের কিছু দাবি আদায় করার জন্য লড়াই পরিচালনা করতে পারে, তাই নয়, সময় মতো ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিপ্লবও তারা শুরু করে দিতে পারে; হাজার মার খেয়েও পুলিশ-মিলিটারির বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে তারা লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। ঠিক এমনটাই ঘটেছে ভিয়েতনামে। সেখানে আক্রমণকারীরা বোমা মেরে মেরে জনগণকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইলেও তারা পিছিয়ে যায়নি, তাদের লড়াই ছেড়ে দেয়নি।

ভিয়েতনামের এইসব মানুষ, যারা লড়াই ছেড়ে পালায়নি, তারা কারা? মনে রাখবেন, তারা আপনাদের মতোই চাষী। তারা রাইফেল কাঁধে নিয়ে লড়েছে; আবার যখন শত্রুর হাওয়াই জাহাজ নেই, বোমারু বিমান নেই — ঘর থেকে, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে চাষবাস করেছে। বিপক্ষ দলের সৈন্য এলে সামনাসামনি পড়লে তারা গুলি চালিয়েছে, চলে গেলে আবার চাষ করেছে। যখন শত্রুর আক্রমণের সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি, তখন ভবিষ্যতে আবার শত্রুকে সংঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণ হানার জন্যই পিছু হঠেছে। কিন্তু তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সাহস, মনোবল, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য তারা হারায়নি। তাদের সামনে লক্ষ্য ছিল — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা, সায়গন সরকারকে পরাস্ত করা এবং জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা। আপনাদের সামনে লক্ষ্য হচ্ছে — পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উৎখাত করা এবং সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ভিয়েতনামের জনগণ কখনও এ অজুহাত দেখায়নি — "আমাদের হাওয়াই জাহাজ নেই, বোমারু বিমান নেই, ট্যাঙ্ক নেই, গোলাবারুদ নেই আমরা কীভাবে লড়ব?" তারা এসব কথা বলেনি। কেন বলেনি? তারা কি মানুষ নয়? তারা কি কৃষক নয়? তাদের কি না খেয়ে থাকতে হয়নি? ক্ষুধা, অভাব এসবের জ্বালা-যন্ত্রণা কি তাদের ভোগ করতে হয়নি? আপনারা মনে রাখবেন, তাদের অবস্থাও ঠিক আপনাদের মতোই ছিল। তাহলে এই মনোবল ও শক্তি তারা পেল কোথা থেকে, যার জোরে তারা এতবড় একটা লড়াই চালিয়ে যেতে পারল? এটা তারা পারল একমাত্র এই কারণেই যে, তারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল; লড়াইয়ের সঠিক পথ চিনতে এবং সর্বোপরি সঠিক রাজনৈতিক লাইন ও সঠিক রাজনৈতিক পার্টিকে চিনতে তারা ভুল করেনি। ফলে, আপনাদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন ঃ ভুলে যাবেন না — শুধুমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নামাবলি গায়ে জড়ালেই, কিংবা 'সমাজতন্ত্র চাই', 'বিপ্লব চাই' বলে স্লোগান তুললেই কোন দল সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হয়ে যায় না। বিপ্লবী দলের প্রধান কাজ শুধু 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চিৎকার করা নয়, বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভাসাভাসাভাবে বলা নয়। একটি যথার্থ বিপ্লবী দলের প্রধান কাজ হ'ল, সেই বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই সেই দেশের বিপ্লবের সঠিক রাস্তাটি নিরূপণ করা; সেই সাথে এই মূল রাজনৈতিক লাইনের পরিপূরক দৈনন্দিন সংগ্রামগুলি সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার উপযুক্ত জনতার রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা। কিন্তু আমাদের দেশের মেকি মার্কসবাদীরা ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতির চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে প্রায়শই গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এদের বেশিরভাগ বিভ্রান্তিই দেখা দিয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসঙ্গকে ঘিরে। যদিও আমি ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দেখিয়েছি কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের কিছু কিছু অবশেষ থেকে গেলেও কীভাবে ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাহলেও অন্য আর একটি দিক থেকে বিষয়টিকে আমি পুনরায় আলোচনা করছি।

গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা

দেখা যাক, আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলি কী। যেমন প্রায়শই আমরা স্লোগান তুলি 'চাষীর হাতে জমি চাই।' আপনাদের সংগঠন কে কে এম এফ-ও এই দাবি তোলে এবং এই দাবিতে বহু সময় লড়াইও আপনারা গড়ে তুলেছেন। কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে, এটাই কি চাষীজীবনের প্রধান বা মৌলিক সমস্যা? একথা ঠিক, যত জমি সিলিংয়ের ঊর্ধ্বে বেনাম হয়ে আছে, তা উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করার জন্য আমরা জোরদার লড়াই করব। বর্তমানে যতটা সিলিং আছে তা আরও কমিয়ে এনে আরও বেশি জমি উদ্ধার করে চাষীদের দেওয়ার জন্যও আমাদের লড়তে হবে। কিন্তু এসব দেখে আপনারা যদি মনে করেন, চাষীর হাতে জমি দিলেই চাষীজীবনের মূল সমস্যা মিটবে, তাহলে

আপনারা মারাত্মক ভুল করবেন। কারণ, প্রথমত, আমাদের জানা দরকার, যে ন্যূনতম পরিমাণ জমি দিলে একটি পরিবার সাধারণভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে, আমাদের গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রতিটি পরিবারকে ততটা পরিমাণ দেওয়ার মতো জমি ভারতবর্ষে নেই। স্বভাবতই, যদি সমস্ত জমি উদ্ধার করে চাষীদের বিলিও করা যায়, গ্রামের একটা বিরাট জনসংখ্যা পড়ে থাকবে, যাদের জমি দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি, জনসংখ্যা বাড়ে, কিন্তু জমি বাড়ে না এবং জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোরও একটা সীমা আছে। এখন, আমরা যদি প্রতিটি ভূমিহীন চাষী, খেতমজুর ও গরিব চাষী পরিবারকে মাত্র ৯ বিঘা করে জমি দেব বলে ঠিকও করি এবং বেনামে জমি দেশে যা আছে এমনকী তার সমস্তটা উদ্ধারও করি, তাহলেও প্রতিটি পরিবারকে ঐ ৯ বিঘা করে জমি আমরা দিতে পারব না। যদিও, প্রায় দুই দশক আগে একটা হিসেব কষে দেখানো হয়েছিল, সাধারণভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য একটা চাষী পরিবারের কমপক্ষে ১২ বিঘা জমি দরকার। একেই বলা হচ্ছে 'ইকনমিক হোল্ডিং'। এখনকার বাজারদর ও মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আজ তা সঙ্গতকারণেই ১৫ বিঘা ধরা যায়। তাহলেও বর্তমান হিসেবের জন্য আমি এটা ৯ বিঘাই ধরে নিচ্ছি। এখন, একটা পরিবারকে যদি ৯ বিঘা জমি দেওয়া হয়, তাহলে সেই জমি দিয়ে সে হয়ত আজ কোনরকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে;কিন্তু যাকে ৯ বিঘা জমি দেওয়া হ'ল, কাল তার সন্তানসন্ততি হবে। সরকারি পরিবার পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি তার তিনটি সন্তানও হয়, তাহলে তার সন্তানদের ভাগে সেই জমি গিয়ে ৩ বিঘা করে দাঁড়াবে। এই ৩ বিঘা জমি দিয়ে কোন পরিবার চলে নাকি? তারপর সেই সন্তানরা যখন আবার বিয়ে করবে এবং তাদেরও সন্তানসন্ততি হবে, তখন অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ফলে একথা পরিষ্কার, জমি উদ্ধার করে চাষীর হাতে বিলি করার প্রোগ্রাম আজও আমাদের দেশের চাষী আন্দোলনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম হলেও এটাই গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি এবং চাষীজীবনের প্রধান সমস্যা নয়। প্রধান সমস্যা হচ্ছে, জমি উদ্ধার করে বিলি করার পরও গ্রামে যে বাড়তি জনসংখ্যা থেকে যাবে, শুধু যাদের জমি দেওয়া যাবে না, তারাই নয়, যে বাড়তি জনসংখ্যা প্রতিদিন গড়ে উঠবে, তাদেরও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এটাই হচ্ছে চাষীজীবনের মূল সমস্যা।

কিন্তু এই বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে কী করে, যদি না দেশে শিল্পোদ্যোগের রাস্তা, কলকারখানার অবাধ বিকাশের রাস্তা খুলে দেওয়া যায়? অথচ ঘটনা এটাই যে, আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোগের সমস্ত রাস্তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্য রুদ্ধ হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো, গ্রামীণ জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং শিল্পকে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য আমাদের দেশের কৃষির আধুনিকীকরণ ঘটানো জরুরি। কিন্তু সেখানেও পুঁজিবাদ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে কৃষির এই আধুনিকীকরণ হতে পারে না। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক আজ এ পথে এক গুরুতর প্রতিবন্ধক হিসাবে বিরাজ করছে; পুঁজিপতিরা কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ চায় না। একাজ তারা করতে পারে না। কেন পুঁজিপতিরা একাজ করতে পারে না, সেটা আপনাদের বুঝতে হবে।

আপনাদের বুঝতে হবে, আজ আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থাটা কী। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে থাকে। এই গ্রামে যারা থাকে, জমির সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িয়ে আছে, সেই জনসংখ্যার আবার শতকরা ৫১ ভাগ থেকে ৫৩ ভাগ হচ্ছে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুর। এক বিঘে থেকে পাঁচ বিঘে পর্যন্ত জমি রয়েছে এরকম লোকের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৫ ভাগ। আবার নিম্নমধ্য চাষী, যাদের পাঁচ থেকে পনের বিঘে পর্যন্ত পরিবার পিছু জমি আছে, তাদের সংখ্যাও শতকরা ১৫ ভাগ। ফলে, গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষ হচ্ছে সর্বহারা, আধা-সর্বহারা; গ্রামের এইসব মানুষের সারা বছর গ্রাসাচ্ছাদনের কোন সংস্থানই প্রায় নেই। এদের ক্রয়ক্ষমতা বলে কিছু নেই। বেঁচে থাকার ন্যূনতম সম্বলটুকুও এদের নাগালের বাইরে। দয়া করে কতিপয় বিশেষজ্ঞের তৈরি করা সরকারি পরিসংখ্যান দিয়ে গ্রামের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করবেন না। এইসব পণ্ডিতরা সম্পূর্ণ ভুলভাবে খেতমজুর বলতে একমাত্র তাদেরকেই বোঝেন, যাদের কোন জমি নেই। কিন্তু আমাদের দেশে এক থেকে তিন বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক যারা, তারাও অন্যের জমিতে দিনমজুরির কাজ করে এবং দেশের মোট খেতমজুরদের একটা বড় অংশই হচ্ছে এইসব চাষীরা। এদের বেশিরভাগেরই সারা বছর কোন কাজ থাকে না; অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় এদের দিন কাটে। সুতরাং গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা এই ৮৩ ভাগ লোকের বাজার থেকে কিছু কেনবার ক্ষমতাই নেই। তারা নিজের খেতের চাল বিক্রি করে গম কিনে খায়। শিল্পজাত দ্রব্য তারা কিনবে কী করে? বাজারে চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়বে কী

করে? আর চাহিদা যদি না বাড়ে, তাহলে পুঁজিপতিরা, যাদের যাবতীয় মাথাব্যথা বাজার নিয়েই, অন্য কিছু নিয়ে নয়, তারা মাল উৎপাদন করবে কেন? আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোগের কোন তাগিদই নেই, এটাই হচ্ছে তার মূল কারণ। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের সামাজিক তাগিদ আজ অনুপস্থিত। অবশ্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শিক্ষিত মানুষদের বিভ্রান্ত করতে এক সুচতুর প্রচার চালাচ্ছেন; তিনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, আমাদের দেশে নাকি পুঁজি নেই — তাই শিল্পোদ্যোগ, বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠতে পারছে না। আমি বলি এটা ডাহা মিথ্যা কথা। শিল্পের অপ্রতিহত বিকাশ আজ অসম্ভব। কারণ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমাগত সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে শিল্পবিপ্লবের সামাজিক তাগিদও আজ নেই। যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথাই সত্য হয়, তাহলে তাকে কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি — আমাদের দেশে যতটুকু পুঁজি প্রতিদিন গড়ে উঠছে, জমির মালিকরা ফসল বিক্রি করে যে পুঁজি সঞ্চ য় করছে, মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে যতটুকু পুঁজি প্রতিদিন জমছে, তা 'ব্যুরোক্রেটিক' অলস হয়ে থাকছে কেন? কেন সেই পুঁজি শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ হচ্ছে না? শুধু তাই নয়, পুঁজি নতুন শিল্পোদ্যোগে লাগানো দূরের কথা, বরং কলে-কারখানায় উৎপাদনের যতটুকু ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাকেও আজ পুরোপুরি সদ্ব্যবহার অসম্ভব হচ্ছে কেন? কেন লে-অফ হচ্ছে? কেন শিল্পের 'ক্লোজার' (বন্ধ হয়ে যাওয়া) একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে? শ্রমিকশ্রেণীর সামনে প্রতি মুহূর্তে লে-অফের খাঁড়া কেন ঝুলে থাকছে? এসবের অর্থ কী? আসলে উৎপাদন বাড়তি হয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে উৎপাদন যত অল্পই হোক না কেন, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে সেই স্বল্প উৎপাদনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাড়তি উৎপাদনের সঙ্কট ডেকে আনছে। এর থেকে একটা জিনিসই পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে; তা হচ্ছে, শিল্পের যতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে তাকে এবং মজুরের শ্রমশক্তিকে জোর করে অলস করে রাখা হয়েছে। অর্থনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই আপনারা ধরতে পারবেন, যেখানে উৎপাদনের জন্য একটা তাগিদ থাকে, যেখানে বাজার ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়, সেখানে এ জিনিস কখনোই ঘটতে পারে না। আমাদের মতো একটি গরিব দেশে, যেখানে এমনকী জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মানুষ মেটাতে পারে না, যে কারণে আভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে, সেখানে শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা হলে তা অতি উৎপাদনের সমস্যা সৃষ্টি করবেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই সঙ্কটই কৃষিতে যন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে আটকাচ্ছে। কারণ, ক্রমাগত শিল্পোদ্যোগ না হওয়ার জন্য এমনিতেই শহরে বেকার সমস্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। অন্যদিকে, আগেই বলা হয়েছে গ্রামে বেশিরভাগ লোকের সারা বছরের কাজ নেই। ফসল বোনা এবং ফসল কাটার সময় যতটুকু কাজ মেলে, তার বাইরে বাকি সময় বেশিরভাগ লোকের প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই থাকে না। এরকম পরিস্থিতিতে কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় যদি কৃষিতে যন্ত্রীকরণ হয়, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস শুরু হয়, তাহলে গ্রামের যে মানুষগুলো জমিতে কাজ করে দিন গুজরান করছে, তারা বেকার হয়ে যাবে। যারা অর্ধবেকার হয়ে আছে, জমিতে খানিকটা যুক্ত থেকে এটা-ওটা করে যারা কোনমতে টিকে আছে, অথবা, ছোট ছোট চাষী, যাদের ২/৪ বিঘা জমি আছে — সব চলে যাবে। বিরাট বিরাট জোত করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস হলে ফলন অনেক বাড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এর ফলে নতুন করে যে বিশাল বেকারবাহিনী গ্রামে সৃষ্টি হবে, সেই বেকার সমস্যার চাপ পুঁজিবাদী অর্থনীতি সামাল দেবে কী করে? তাই পুঁজিপতিরা কী চাইছে? তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে নানা টোট্‌কা কবিরাজি করে, সবুজ বিপ্লবের স্লোগান তুলে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন অবস্থায় ফেলে রেখে, পুরনো মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে চাষবাস চালিয়ে খণ্ড খণ্ড জমিতেই তাদের আটকে রাখতে চাইছে। এটাই হচ্ছে কংগ্রেসের ভূমিসংস্কার নীতির মূলমন্ত্র, যাকে তারা 'প্রগতিশীল' বলে চালাবার চেষ্টা করছে।

এখন যদি দেখা যায়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এমন দলগুলিও কৃষি সমস্যা মোকাবিলায় একই ধরনের ভূমিসংস্কার নীতির পক্ষে সওয়াল করছে, তাহলে তার দ্বারা বাস্তবে এটাই বোঝায় যে, তারাও একটু ভিন্ন উপায়ে, ভিন্ন কথার আড়ালে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে ঐ খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যে অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন অবস্থাতেই বেঁধে রাখতে চায়। গ্রামের মানুষদের দু'এক বিঘা জমিতে বেঁধে রেখে আদিম বর্বর যুগের অভাবনীয় দারিদ্র্যজর্জরিত জীবন কাটাতে বাধ্য করারই একটা পরিকল্পনা এটা। পুঁজিবাদের দালাল যারা, যারা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তারাই এই কাজ করতে পারে। কিন্তু যারা নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি

করে, এটা তাদের প্রোগ্রাম হয় কী করে! যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তো ভূমিহীন খেতমজুর এবং গ্রামের সবচেয়ে গরিব অংশের মধ্যে জমি বিলির দাবি তোলার পাশাপাশি কৃষির আধুনিকীকরণ চাইবে, কৃষির উন্নতি দাবি করবে।

তার জন্য পুরনো ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থা যেটা আজ কায়েম রয়েছে, তাকে তারা ভাঙতে চাইবে। প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা তাদের ভাঙতে হবে, কারণ যেসব কাজ তারা করতে চায়, পুঁজিবাদ তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা 'চাষীর হাতে জমি' দেওয়ার স্লোগান তোলার সময় একই সাথে কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস প্রবর্তনেরও স্লোগান তুলবে। আর এই স্লোগান তোলার সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে বলবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে, ক্ষমতা দখলের লড়াই করতে। কারণ আমরা জানি, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করার দ্বারাই একমাত্র পুঁজিবাদী শোষণের নাগপাশ ও শৃঙ্খল থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করা যায়। এবং শিল্প ও কলকারখানার বিকাশ ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা যায়। একমাত্র এই অবস্থাতেই কৃষিতে যন্ত্রীকরণের ফলে গ্রামে যত মানুষ বেকার হবে তাদের সকলকেই প্রতিনিয়ত গড়ে ওঠা নতুন নতুন কলকারখানায় কাজ দেওয়া যাবে। তাই, গ্রামের মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থেই মেশিন ট্র্যাক্টর চায় এবং চায় বলেই — যে পুঁজিবাদের জন্য মেশিন ট্র্যাক্টর আনা যাচ্ছে না, সেই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের বিপ্লবের কথা সে বলবে।

পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র পথ

তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের সামনে তিনটি মূল সমস্যা। প্রথমটি হচ্ছে বেকার সমস্যা, দ্বিতীয়ত, কৃষির আধুনিকীকরণের সমস্যা, এবং তৃতীয়ত, শিল্পবিপ্লব ও শিল্পের অবাধ অগ্রগতির সমস্যা — যার সাথে আগের দু'টি সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ, শিল্পবিপ্লবের দ্বার খুলে দিতে না পারলে কৃষির আধুনিকীকরণ করা এবং তার দ্বারা আভ্যন্তরীণ বাজারের লাগাতার সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব নয়, বেকার সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। আর এই কাজটি করতে হলে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আপনাদের সংগঠিত করতে হবে। ফলে মুখে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নানা তত্ত্ব আওড়াতে আওড়াতেই যারা কোন না কোন অজুহাতে এই মূল প্রশ্নটি কৌশলে এড়িয়ে যায় এবং এই মূল কর্তব্যটি পরিহার করে, তারা আমাদের দেশে গণআন্দোলনের মধ্যে নানা ধরনের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ধারারই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এমন সমস্ত দলের মধ্যে আমাদের দল এস ইউ সি আই ছাড়া খোলাখুলি ভাষায় পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা সিপিআই বা সিপিআই(এম) কেউই বলছে না। তারা অবশ্য একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে। যেখানে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্যই জনগণের উপর শোষণ-জুলুম চলছে, সেখানে সমস্ত পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের দায়দায়িত্ব অত্যন্ত সুচতুরভাবে গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এইসব দলগুলি জনগণের দৃষ্টি থেকে সেই পুঁজিপতিশ্রেণীকেই আড়াল করতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে, একচেটে পুঁজিবাদ পুঁজিবাদের বিকাশেরই একটা বিশেষ স্তর ছাড়া আর কিছু নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে না ভেঙে কীভাবে একচেটে পুঁজির শাসনকে আপনি উৎখাত করবেন? এই অবস্থায় একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই সব স্লোগানই ফাঁকা স্লোগান, মিথ্যা স্লোগান হতে বাধ্য। আপনারা জানেন, এমনকী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে বক্তৃতায় পিছিয়ে নেই। ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসও আজকাল একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লোকঠকানো স্লোগান তুলছে। ফলে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামেই হোক, আর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামেই হোক, মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই যদি কোন পার্টি পুঁজিবাদী শোষণের দায়-দায়িত্বটা গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গোটা পুঁজিপতিশ্রেণীকেই আড়াল করতে চায়, তাহলে তাদের মতলবও তো ইন্দিরার থেকে আলাদা কিছু নয়।

আমাদের দেশে পুঁজিবাদ যে অবস্থাতেই থাকুক, যত পিছিয়ে-পড়া অবস্থাতেই থাকুক, এখানে পুঁজিবাদী শোষণই জনগণের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ; পুঁজিবাদই জনগণের মূল শত্রু। এখানে কৃষিতে শোষণও পুঁজিরই শোষণ। জমি এখানে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জমিতে পুঁজি খাটিয়ে লাভ করা যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লোটা যায়। জমি এখানে হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুই একটি মাধ্যম, একটি যন্ত্র — যেখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় এবং মুনাফা করার জন্য সেই উৎপাদিত পণ্য জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারে বিক্রি করা হয়। জমিতে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে — যেহেতু দেশটা একটা পিছিয়ে পড়া দেশ

— তাই মূল পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী শোষণের সাথে কিছু কিছু সামন্তী বৈশিষ্ট্য খাদ হয়ে মিশে আছে; যেমন করে আসলের সঙ্গে ভেজাল মিশে থাকে। সোনার মধ্যে খাদ মিশে থাকে। ফলে প্রশ্ন হচ্ছে, আঘাতটা আমরা কাকে করব — ভেজালটাকে, খাদটাকে, না পুঁজিবাদ — যেটাই শোষণের মূল কারণ, তাকে? যারা মূল শত্রু পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের কথা না বলে সামন্তী অবশেষ যতটুকু আজও এই পুঁজিবাদী শোষণের মধ্যে, ভারতীয় পুঁজিবাদের পিছিয়ে পড়া অবস্থার জন্য, ভেজাল হয়ে, খাদ হয়ে মিশে আছে, তাকেই আঘাত করার কথা বলে, তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে যত গরম গরম বক্তৃতাই করুক, আসলে তারা পুঁজিবাদী শোষণের পক্ষেই ওকালতি করে — একথাটা আপনাদের খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। আপনাদের বুঝতে হবে, রাষ্ট্রক্ষমতা যাদের দখলে সেই বুর্জোয়ারা, সেই পুঁজিপতিরাই আপনাদের মূল শত্রু। এই মূল প্রশ্নে যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, জনতাকে ভুল বোঝায়, সত্যকে আড়াল করতে চায়, ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে গুরুতর বিষয় হিসাবে তুলে ধরে যারা সত্যকে চাপা দিতে চায়, তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিলেও তারা আসলে জনগণের চরম শত্রু।

ভারতবর্ষের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করুন

তাহলে এই সমস্ত আলোচনা থেকে আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন, ভারতবর্ষের মূল সমস্যা তিনটি — বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষির আধুনিকীকরণ এবং শিল্পের বিকাশ, এই তিনটি প্রশ্নই ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং গোটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। তাই ভারতবর্ষের বিপ্লব পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার বিপ্লব, বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত করার বিপ্লব। এই বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে পারলে তবেই একমাত্র একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-জুলুম আর সামন্তী অভ্যাস — আমাদের গ্রামীণ জীবনে যা আজও টিকে আছে, তারও অবসান আমরা ঘটাতে পারব। ফলে এই পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব আপনাদের সংগঠিত করতে হবে, আর এই বিপ্লবের জন্যই আপনাদের অতি অবশ্যই সঠিক বিপ্লবী দলকেও চিনে নিতে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে সেই বিপ্লবী দল হচ্ছে এস ইউ সি আই। আপনারা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের মজুররা আজ পর্যন্ত কম কোরবানি করেনি, চাষীরা কম জান দেয়নি, যুবকরা কম রক্তক্ষয় করেনি। বহুবার তারা প্রতিবাদে-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, বহুবার বহু দলের পেছনে জড়ো হয়ে লড়েছে। কিন্তু সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি আজও তাদের মেলেনি। কারণ, এতদিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে সমস্ত পার্টি এই আন্দোলনগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে, মুখে তারা লড়াইয়ের কথা বললেও, বিপ্লবের কথা বললেও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বললেও আসলে তারা পেটিবুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পার্টি। তারা হচ্ছে মুখোশ পরা শোধনবাদী পার্টি। তারা পুঁজিবাদী শোষণকে, বুর্জোয়াশ্রেণীর জুলুম-অত্যাচারকে আড়াল করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদ আর একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। এই কারণেই আপনাদের এত রক্তক্ষয়, এত কোরবানি সত্ত্বেও আপনাদের সমস্ত লড়াই মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন, এই সম্মেলন থেকে আপনারা প্রতিজ্ঞা নিয়ে যান — আপনাদের দৈনন্দিন সংগ্রামগুলি পরিচালনা করার সাথে সাথে আপনারা গ্রামভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক শক্তিশালী পার্টি কমিটি এবং কে কে এম এফ-এর কমিটিগুলোকে এমন রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তুলবেন যাতে তারা সমস্ত রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। সমস্ত প্রকার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে লড়াইকে যেকোন স্তরে নিয়ে যেতে পারে এবং সমস্ত রকমের সুবিধাবাদী শক্তির খপ্পর থেকে ভূমিহীন খেতমজুর, গরিবচাষী ও মধ্যচাষীকে মুক্ত করে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে শোষণমুক্তির সংগ্রামে তাদের সংগঠিত করতে পারে। ভারতবর্ষে আজ হোক, কাল হোক বিপ্লব হবেই। যদি সত্যিকারের বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করতে, পার্টিটাকে গ্রামভিত্তিক মজবুত করে গড়ে তুলতে আপনারা বিশ বছর সময় নেন, তাহলে ভারতবর্ষের বিপ্লব বিশ বছর অপেক্ষা করবে। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের মানুষ দশ বছরেই এইসব মেকি বিপ্লবী পার্টিগুলোর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে সত্যিকারের বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হতে পারেন, যদি সমস্ত এলাকায় স্তরে স্তরে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে দশ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে বিপ্লবের দাবানল জ্বলে উঠবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেক মানুষ বিপ্লব চায়; শুধু সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা আর সেই পার্টির উপযুক্ত শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠার অপেক্ষা। যদি আপনারা সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে ও তার নেতৃত্বকে

প্রতিষ্ঠিত করতে না পারেন, তবে বিপ্লব আপনা-আপনি হয়ে যাবে না। ভ্রান্ত দলগুলো সম্পর্কে মিথ্যা মোহ নিয়ে চললেও বিপ্লব হবে না। এইসব মেকি বিপ্লবী দলগুলো আজ যতই লাফালাফি করুক, শেষপর্যন্ত জনতাকে তারা কেবল ভোটের মধ্যেই টেনে নিয়ে যাবে যাতে তারা উজির-নাজির হতে পারে, মন্ত্রী হতে পারে। ফলে সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে না পারলে আপনাদের সমস্ত কোরবানি, সমস্ত লড়াই আগের মতোই বারে বারে মুখ থুবড়ে পড়বে, হাজার লড়াই সত্ত্বেও পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি আপনাদের মিলবে না। এই প্রসঙ্গে লেনিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। শোষণ-শাসনে জর্জরিত নিপীড়িত মানুষদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, যত গৌরবময় লড়াই-ই তারা করুক, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যত দাবিই তারা আদায় করুক, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিপ্লবী তত্ত্ব, সঠিক বিপ্লবী লাইন ও সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি — এই তিনটি জিনিস আয়ত্ত করতে না পারছে, ততক্ষণ হাজার লড়াই, হাজার কোরবানি সত্ত্বেও পুঁজিবাদের শোষণ-জুলুমের হাত থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না। এই কথা বলে, সত্যিকারের বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই এবং কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনকে সমস্ত দিক থেকে শক্তিশালী ও মজবুত করে গড়ে তোলার আহ্বান আবারও আপনাদের জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। পরবর্তীকালে সংগঠনের নাম ‘কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন’-এর পরিবর্তে ‘অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন’ করা হয়েছে।

২। প্রগতি দল

৩। ভারতীয় ক্রান্তি দল

৪। সোস্যালিস্ট পার্টি

৫। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি। এগুলি মূলত বুর্জোয়া দল, বর্তমানে অস্তিত্বহীন।

১০ মার্চ ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ দলের বাংলা মুখপত্র
‘গণদাবী’তে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয়।